International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.19-29
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i4.2024.19-29

বাংলা কথাসাহিত্যে ভুবনে মহাজীবন ও স্বামী বিবেকানন্দ

সিদ্ধার্থ দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো- কানহো- বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Speech in literature of great life talk in many ways get up has come In the light of Mahajivan , all the great people who have become shapers of the future in the lives and minds of the nations and the movement of thoughts, their idealized extraordinary lives become the subject of novels. For the common Bengali mind, the biographies of those great men became the mantra of liberation, the logistics of survival, the reservoir of transition. Among them are Gautama Buddha, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rammohan Ray, Ishwarchandra Vidyasagar, Ramakrishna Paramahansadeva and others. Again in that vein, the intense existence of Ramakrishna's famous disciple Swami Vivekananda has come up in Bengali fiction in various ways.

today from ages in the past one great man of humanity the word by hearing of truth on the way heart religion with Incarnation become got up he Buddhade b. his life story Bangla in fiction in many ways comes up On the other hand, the influence of Buddhadeva was to a great extent in Swami Vivekananda. Caitanyadeva's influence on Chaitanyatto or Nglasa literature is far-reaching. He has been studied a lot. He had not yet entered the field of fiction , but his consciousness of human liberation , that is, purer consciousness, became intensive in the greater identity of life. Bengali Literature 'Great Life' the word By keeping him in front Suprasi gains success.

Raja Rammohan Roy is the founder of modern India and the pioneer of renaissance. He is self-educated, well-educated, forever imprisoned as a social reformer. The word of his virtuous life has become the means of survival for the average middle class Bengali. His life and work became the subject of literature, on the other hand, Ishwarchandra Vidyasagar is still remembered with respect in the society of Bengal. He is a man of the nineteenth century. His hardworking life is a role model for every Bengali. He singlehandedly revitalized the diseased society, established the truth of life. His virtuous life and active life enriched the branch of Mahajivani

Sri Ramakrishna Paramahansadeva's contribution to the religious sphere of Bengal in the 19th century is undeniable. He brought about a change in the social mind of Bengal.

Sri Ramakrishna's life full of spiritual thoughts in pursuit naturally flourishes in Bengali literature.

The history of serial biographies of the great man gained momentum from the beginning of the 29th century. Bengali public life torn by the conflict of hope and despair, Mukti Prana tried to find the man in the biography of the great man. Swamiji's life and work became a platform for self-emancipation, an awakening of consciousness for the directionless people.

কথাসাহিত্যে মহাজীবনের কথা নানাভাবে উঠে এসেছে। সাধারণত মহামানবের কর্মমুখর ও পুণ্য জীবনই মহাজীবনের বিষয়-আশয়। সেই জীবন ব্যাপ্তি ও গভীরতায়, ত্যাগে ও সেবায় মহান আদর্শে দীক্ষিত হয়ে মহামানবে উত্তীর্ণ হয়। তাঁদের মহিমা ও প্রভাব সমাজ জীবনে অসীম ও অনস্বীকার্য। সেই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বরা দেশ ও জাতির নিকট আত্মীয় হয়ে ওঠেন। আমাদের বাস্তব সংসারে তাঁরা চিরকালের সম্পদ। নানা অনুভূতির আলোকমালায় সেইসব মহামানবের জীবনী আমাদের পাথেয়। সেখানে মানুষের জীবনে মহাজীবনীর আলোর পরশ স্বাভাবিক ভাবেই পাথেয় হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে মহামানবের জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অজানা খনির পরশমণির পরিচয়ে জীবনী সাহিত্যের অনস্বীকার্য ভূমিকা আপনাতেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। জীবনের আধারেই সেই মহাজীবনের হাতছানি সেক্ষেত্রে কথাসাহিত্যের রক্তমাংসের সজীবতায় তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার পরিচয় সমুজ্জ্বল। জীবনে জীবনের যোগে মহাজীবনের সংযোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। সেই ধারাতেই স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবন বাংলা কথাসাহিত্যের মহার্ঘ সংযোজন ঘটে এবং তা একটি স্বতন্ত্র ধারায় বিস্তার লাভ করে। সেই ধারায় পৌঁছানোর জন্য প্রথমে জীবনী সাহিত্যের পরিচয়ের আধারে পাশাপাশি সময়ান্তরে সম্প্রসারিত কথাসাহিত্যে মহাজীবনের পরিচয় প্রদান করা জরুরি হয়ে ওঠে।

আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে জীবনীচর্চার পরিসর সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে। ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ এর মধ্যেও অসংখ্য মহাজীবনের পরিচয় রয়েছে। আধুনিক যুগে মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনীসাহিত্যের পরিসরেও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে গদ্য সাহিত্যের সূচনাকালে রামরাম বসু লেখেন ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ (১৮০১)। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। এই গ্রন্থের অনুকরণে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং’ রচনা করেন। আধুনিক যুগের সূচনালগ্নে জীবনীসাহিত্যের ধারার যে সূত্রপাত হয়েছে, তার গতিবেগ আজও সামানভাবে ও সমানতালে বয়ে চলেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে কবি ও সাংবাদিকরূপে সুপরিচিত হয়ে আছেন। সাংবাদিকতার সূত্রেই তিনি জীবনী সাহিত্য রচনা শুরু করেন। কবি রামপ্রসাদ সেনকে কেন্দ্র করে লেখেন, ‘অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন–রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত’। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তিনি রচনা করেন ‘ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত’।

বাংলা সাহিত্যে মহাপুরুষের জীবনী, ধর্মীয় ব্যক্তিদেরও জীবনী লেখা শুরু হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন বসুর ‘স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী’ (১৮৮৯), শশিভূষণ বসুর ‘সাধু গিরীন্দ্রমোহন’(১৮৮৯)। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে জীবনী সাহিত্যের পাশাপাশি নিজ জীবনের কথা বা আত্মচরিত লেখার প্রচলন শুরু হল, এই আত্মচরিত রচনার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের আবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ‘আত্মজীবনী’

(১৮৯৮), কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' (১৮৮৩), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৮৯৮), রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালে প্রকাশিত)।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক মহামানবের জীবনী লেখা শুরু হল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন পৌরাণিক চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে 'কৃষ্ণচরিত্র'। সাহিত্য সম্রাটের অপর জীবনী সাহিত্য 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' (১৮৭৭)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জীবনী সাহিত্য রচনার জোয়ার এল। স্মরণীয় ও বরণীয় মহাপুরুষগণের জীবনচরিতে সাহিত্যের শাখা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়' (১৮৮১), উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' (১৮৮৫), শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' (১৮৯১), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫), বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর', মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৮৫), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৬), নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' (১৯২০), বঙ্কুবিহারী করের 'মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' (১৯১১)।

আধুনিক পরিসরে সাহিত্যে চরিত্র প্রাধান্য লাভ করে। এর পূর্বে প্রাচীন সাহিত্যে ঘটনামুখ্য নাটকে প্লট বা কাহিনিবৃত্তের আধারে ছকবন্দি চেতনায় চরিত্রের গুরুত্ব প্রাধান্য না পেলেও মহাকাব্যে পেয়েছিল। সেদিক থেকে মহাকাব্যের আধুনিক সংস্করণ উপন্যাসের মধ্যে চরিত্রের প্রাধান্য স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অবশ্য মহাকাব্যের চরিত্রের সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রের পার্থক্য বর্তমান। মহাকাব্যে লৌকিক চরিত্রের সঙ্গে অলৌকিক চরিত্রের সহাবস্থান ঘটে। অন্যদিকে সেই চরিত্রগুলি ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রত হওয়ায় সেগুলির বিস্তার সম্ভব হয়ে ওঠে না। চরিত্রগুলি কোনো মহত্তর বা বৃহত্তর মানুষের প্রতিনিধি, মানবিক আদর্শ বা অমানবিক পশুত্বের প্রতিভূ। ব্যক্তিমানসের পরিচয় সেখানে দুর্লভ। সেক্ষেত্রে আধুনিক চেতনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের আলোয় উপন্যাসের জন্ম। স্বাভাবিক ভাবেই তার বাস্তবজনোচিত চরিত্রের বিকাশই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করে। সেখানে একে অপরকে জানতে চায়। তবে এই প্রাধান্য একেবারে আসেনি। প্রথমদিকে রোমান্সের পরে এল রোমান্সধর্মী উপন্যাস এবং তার পরে উপন্যাস। প্রথমদিকে ঘটনাবহুল কাহিনিবৃত্তই উপন্যাসে আখ্যানে পরিণতি লাভ করে যা বাস্তব জীবনের সঙ্গে অন্বিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) রোমান্স, 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) রোমান্সধর্মী উপন্যাস এবং 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাস। অন্যদিকে আধুনিকতার অভিমুখে চরিত্রের মাধ্যমেই উপন্যাসের আবেদন মুখর হয়ে উঠেছে। সেখানে যেমন 'আঁতের কথা'(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি') উঠে এল, তেমনই জটিল মনস্তত্ত্ব বহুমাত্রিক রূপে অপরূপতা(জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' (Ulysses), ১৯২২-এ প্রকাশিত, বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অন্যদিকে আধুনিকতার অভিমুখে চরিত্রের মাধ্যমেই উপন্যাসের আবেদন মুখর হয়ে উঠেছে। সেখানে যেমন 'আঁতের কথা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি') উঠে এল, তেমনই জটিল মনস্তত্ত্ব বহুমাত্রিক রূপে অপরূপতা (জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' (Ulysses), ১৯২২-এ প্রকাশিত, বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করা হয়) লাভ করল। উপন্যাসের মধ্যে এল চেতনা প্রবাহমূলক রীতি। অবশ্য ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের গঠনে দৃঢ়সংবদ্ধ প্লট(Organic Plot) থাকায় তাতে চরিত্রের বিস্তারের অবকাশ থাকে না। পূর্ব পরিকল্পিত কাহিনির মধ্যে চরিত্রের বিস্তার হতে পারে না। সেদিক থেকে শিথিলসংবদ্ধ প্লটে (Loose Plot) চরিত্রের বিস্তার স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে। প্রথমটিরক্ষেত্রে 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'শ্রীকান্ত'-এর শ্রীকান্ত, 'পথের পাঁচালী' র অপু, ধাত্রীদেবতা' র শিবনাথ প্রভৃতি চরিত্র লক্ষণীয়।

বাংলা কথাসাহিত্যে উপন্যাসের যথার্থভাবে সূচনা হয় 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) কে কেন্দ্র করে। এর আগে 'আলালের ঘরে দুলাল' বাংলাসাহিত্যে প্রথম উপন্যাস বলে বিবেচিত হলেও তখনও উপন্যাসের যে শিল্পরূপ তা পরিণতি লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মধ্যেও মহাজীবনের পরিসর আমরা নানাভাবে তা লক্ষ্য করি। শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র যখন নীতিবাগিশ বঙ্কিচন্দ্রে পরিণত হলেন,তখন তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও মহাজীবনের ছায়া-কায়া বিস্তার করে। তাঁর শেষজীবনের তিনখানি উপন্যাস যথা 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭) এ মহাজীবনের পরিচয় খুঁজে পাই। আনন্দমঠ উপন্যাসে অনুশীলন তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রসঙ্গ এসেছে। ভবানন্দ, সত্যানন্দ, জীবানন্দ চরিত্রগুলিতে ত্যাগ ও আদর্শের, ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে মহাজীবনের পরিচয় ফুটে ওঠে। 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪) উপন্যাসেও অনুশীলন তত্ত্বের প্রসঙ্গে প্রফুল্ল চরিত্রের যে অবতারণা সেখান থেকে দেবী চৌধুরানী হয়ে ওঠা, পরবর্তীকালে আবার দস্যুরাণী ফিরে গেছে সেই প্রফুল্লে। উপন্যাসে মনুষ্যত্বের পূর্ণরূপ যেমন প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক তেমনি মহাজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সীতারাম' (১৮৮৭) উপন্যাসে সীতারাম হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার মত যোগ্যশক্তির অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের এক আদর্শকে স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এই উপন্যাস লিখেছিলেন। তাই 'সীতারাম' উপন্যাসেও মহাজীবনের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) ও 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসেও মহাজীবনের পরিসর লক্ষ করা যায়। 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাসে দেখা যায় প্রথার সাথে প্রেমের দ্বন্দ্ব। রাজা গোবিন্দমানিক্যের সঙ্গে রাজপুরোহিত রঘুপতির বিরোধ, অবশেষে গোবিন্দমানিক্যের জয়। ত্যাগ ও সেবার মধ্যেই এই জয় প্রতিষ্ঠিত, যার মধ্যেই রয়ে গেছে মহাজীবনের প্রকাশ। 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে লেখক বৃহৎ মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। গোরা চরিত্রের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে চিরন্তন ভারতবর্ষ। আইরিশ সন্তান গোরা জীবনের প্রথম পর্বে গোঁড়া হিন্দু, পরবর্তীকালে তার মধ্যে গোঁড়ামি দূরে সরে গেছে প্রকাশিত হয়েছে মানবতাবোধ, প্রকাশিত হয়েছে মহাজীবনের কথা।

অন্যদিকে উপন্যাসের বিষয়আশয়ের মধ্যেই সাধারণে অসাধারণই শুধু নয়, অসাধারণে সাধারণ যোগেও মহাজীবনের আবেদন তীব্রতা লাভ করে। সেখানে মহামানবের অচেনা-অজানা জীবনের কথা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মনে হয়। শুধু তাই নয়, বিচিত্র প্রকৃতির মহামানবের ঘটনাবহুল জীবনের পরতে পরতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে, শিক্ষার পরিসরকে সম্প্রসারণ ঘটায়। মহাজীবনের মধ্যেই অনন্ত জীবনের হাতছানি মেলায় মহাজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের আবেদন স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। শুধু তাই নয়, জীবনের প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে আনুকূল্য লাভে মহাজীবনের বনেদি ভূমিকা নানাভাবে প্রসারিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে উপন্যাসে মহাজীবনের নিবিড় হাতছানি শুধু অচেনা-অজানা জীবনের কথাই প্রাধান্য লাভ করে না, সেইসঙ্গে জীবনে বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তার বিশ্বস্ত আবেদন আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ইতিহাসে বা জীবনীতে অপ্রকাশিত জীবনের কথাও মহাজীবনীকেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার অপূর্ব সমন্বয়ে অনালোকিত পরিসর আলোকিত হয়ে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। সেদিক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে মহাজীবনের পরিচয় স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। মহাজীবনের আলোকে যে-সকল মহামানব জাতির জীবনে ও মননে ভবিষ্যতের রূপকার ও ভাব-ভাবনার গতি পথের কাণ্ডারী হয়ে উঠেছেন, তাঁদের আদর্শায়িত

অসাধারণ জীবন বিশেষভাবে উপন্যাসের বিষয়আশয় হয়ে ওঠে। সাধারণ বাঙালি মানসের কাছে সেইসব মহামানবের জীবনীগুলি মুক্তির মন্ত্র, বেঁচে থাকার রসদ, উত্তরণের আধার হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রমুখ। আবার সেই ধারাতে রামকৃষ্ণের স্বনামধন্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের নিবিড় অস্তিত্ব বাংলা কথাসাহিত্যে নানাভাবে উঠে এসেছে।

আজ থেকে বহুযুগ পূর্বে এক মহামানব মানবতার বাণী শুনিয়ে সত্যের পথে হৃদয়ধর্ম দিয়ে মূর্তমানবাত্মা হয়ে উঠেছিলেন, তিনি বুদ্ধদেব। আড়াই হাজার বছর আগে লুম্বিনী নগরে রাজা শুদ্ধোধন ও মহামায়ায় সন্তান রূপে পৃথিবীতে আসেন ভগবান তথাগত। তাঁর জীবনকথা বাংলা কথাসাহিত্যে নানাভাবে উঠে আসে। বুদ্ধদেবের প্রতি অপার রহস্যই তাঁকে কেন্দ্র করে লেখার উপন্যাসের বিস্তৃতি একালেও লক্ষ করা যায়। যেমন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘ধর্মপাল’ (১৯১৫), নারায়ণ সান্যালের লেখা ‘আনন্দস্বরূপিনী’ (১৯৫৮), ‘অজন্তা অপরূপা’ (১৩৭৫) প্রভৃতির পরেও বাণী বসুর ‘মৈত্রেয় জাতক’(২০১৪), স্বামী সন্মাত্রানন্দের লেখা ‘নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা’(২০১৭), ‘তোমাকে আমি ছুঁতে পারিনি’(২০১৯) সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘নির্বাণে অনির্বাণ বুদ্ধ ভগবান’ (২০২১) উপন্যাসের ধারা প্রবহমান। ঠিক তেমনি ছোটগল্পের মধ্যে বিশেষ করে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের মধ্যে ‘অমিতাভ’, গল্পে বুদ্ধদেব স্বমহিমায় উপস্থিত। আবার ‘বিষকন্যা’ ছোটগল্পে বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ দিয়েই গল্পের শুরু।

অন্যদিকে বুদ্ধদেবের প্রভাব স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে ছিল। শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম ভাষণে স্বামীজি বুদ্ধের কথা স্মরণ করেছিলেন। অন্যদিকে চৈতন্যত্তোর বাংলাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাঁকে নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তখনও তিনি আসেননি, কিন্তু তাঁর যে মানবমুক্তির চেতনা অর্থাৎ শুদ্ধতর চেতনা, তা জীবনের মহত্তর পরিচয়ে নিবিড় হয়ে ওঠে। বাংলাসাহিত্য ‘মহাজীবন’ শব্দটি তাঁকে সামনে রেখেই সুপ্রসিদ্ধি লাভ করে। মানবতার মূর্তপূজারী শ্রীচৈতন্যদেব আপন প্রতিভায়, ব্যক্তিত্বে, মানবপ্রেমে সর্বোপরি মহামানবরূপে শুধু বাংলাসমাজকেই সমৃদ্ধ করেননি, বাঙালিজাতিকেও জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্বের সীমায় পৌছে দিয়েছিল। তাঁর বাল্যজীবন থেকে শুরুকরে বিদ্যাশিক্ষা, পাণ্ডিত্য, বিবাহ, গয়াগমন, প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু, পুনরায় বিবাহ, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহন, বৃন্দাবন, উৎকল ভ্রমণ, নীলাচলবাসের লীলা, পুরো জীবন হয়ে উঠেছে আপামর জীবনীকারের কাছে পরম উপাদেয়। তিনি মানবরূপী ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরিক মহিমা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর জীবনীর মধ্যে। বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য চরিতামৃত’, লোচনদাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’, জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্য জীবনীসাহিত্য নামক শাখটি সমৃদ্ধ হয়েছিল মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে। আধুনিক যুগেও তা পূর্ণমাত্রায় সচল। সাহিত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যদেবকে নিয়ে জীবনীসাহিত্য লেখার গতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, মণি বাগচীর ‘মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ’ (১৯৬১), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ’ (১৯৬৫), গজেন্দ্র কুমার মিত্রের ‘কান্তা প্রেম’ (১৯৮৫), সমরেশ বসুর ‘জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য’, মৃণালকান্তি দাশগুপ্তের ‘গৌর প্রিয়া’ (১৩৬৮), দীপক চন্দ্রের ‘সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’, শৈবাল মিত্রের ‘গোরা’ (২০১২), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী’(প্রথম খণ্ড ২০১২), রূপক সাহার ‘ক্ষমা করো প্রভু’ (২০১২), আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের ‘মায়া বন্ধকী’, তুহিন মুখোপাধ্যায়ের

'চৈতন্যের শেষ প্রহর' (২০১৮), দেবশ্রী চক্রবর্তীর 'সেথায় তোমার চরণ পড়ে' (২০২০), রজত পালের 'চৈতন্য শেষ কোথায়'(২০২০), ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের 'আলোর মানুষ'(২০২২), রূপক সাহার 'ঘটসুতলি' (২০২২) উপন্যাসেও চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ আছে। প্রভৃতি উপন্যাসে মহাপ্রভু যেন নতুন করে আমাদের সামনে এসেছেন। ঠিক ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি সেই ধারা বিকশিত হয়েছে। যেমন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চুয়াচন্দন', শ্রী দুর্গামোহন রায়ের গল্পগ্রন্থ 'নিমাই পন্ডিতের গল্প'।
মধ্যযুগের সমাজ জীবনে ও ধর্মীয় জীবনে তিনি যে নামধর্মের ও প্রেমধর্মের আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেই আন্দোলনে বাংলাদেশের মানুষ উদ্দীপ্ত হয়েছিল। বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের সেই সব কথা নানাভাবে উঠে এসেছে এবং সেই ধারা এখনও বহমান।

আধুনিক ভারতের রূপকার ও নবজাগরণের পথিকৃত হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত, সমাজ সংস্কারক রূপে চিরবন্দিত। আবার প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি যেমন সকল সময়ই খড়্গহস্ত, তেমনি তিনি ছিলেন মানবতার পূজারী। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কুসংস্কারগ্রস্থ সমাজকে কলুষমুক্ত করেছিলেন। সেদিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর যে গণজাগরণ তার পুরোধা রাজা রামমোহন রায়। তিনিই অনুভব করেছিলেন আধুনিক শিক্ষার সুফল, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সমস্ত কুসংস্কারকে অবজ্ঞা করে কালাপানি পার হয়েছিলেন। তাঁর চেতনার আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল সমগ্র বাংলাদেশ। তাঁর পুণ্যজীবনের কথা আপামর মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার রসদ। তাঁর জীবন ও কর্ম সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। যেমন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন' (১৯৫৫), মণি বাগচীর 'রামমোহন' (১৯৫৮), লীলা মজুমদারের 'রামমোহন', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' (১৯৯৭), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' (পাঁচ খণ্ডে, ২০১২-২০২০) 'নজাগরণের নায়কেরা' (২০২১) উপন্যাসেও ভারতপথিক স্বমহিমায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

অন্যদিকে বাংলার সমাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে নিত্যস্মরণীয়। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাণপুরুষ। তাঁর কর্মময় জীবন আপামর বাঙালির কাছে আদর্শ স্বরূপ। তিনি একক প্রচেষ্টায় ব্যাধিগ্রস্ত সমাজকে গতিদান করেছিলেন, জীবনসত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পুণ্যজীবন ও কর্মময় জীবন মহাজীবনীর শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ধারার অভিনব সংযোজন, তিনি লিখেছেন তাঁর জীবনের দিনলিপি 'বিদ্যাসাগর চরিত' (১৮৯০)। যদিও গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ, তবুও একথা বলতেই পারি জীবনীসাহিত্য ধারায় গ্রন্থটি অমূল্য সম্পদ। মণি বাগচীর 'বিদ্যাসাগর' (১৯৫৭), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' (১৯৯৫), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর' (২০১৭), 'আবর্তে বিদ্যাসাগর' (২০২১), সমীরণ দাসের 'নিঃসঙ্গ ঈশ্বর' (২০১৭), সমীর চক্রবর্তীর 'সিংহ বিদায়'(২০২১), সুরেশ কুণ্ডুর 'বিদ্যাসাগর রণক্ষেত্রে একা', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী' (প্রথম ২০১২ ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০১৩), 'নজাগরণের নায়কেরা' (২০২১), রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জোব মুখুজ্জ্যে বাক্যালাপ' (২০২৩) প্রভৃতি উপন্যাসে বিদ্যাসাগরের সজীব উপস্থিতি বিস্ময়কর।

উনিশ শতকে বাংলার ধর্মীয় পরিসরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার সমাজমানসে তিনি পালাবদল ঘটিয়েছিলেন। যিনি সাধারণ জীবন যাপনের মধ্যে রেখে গেছেন অসাধারণের প্রভাব। কামারপুকুরের গদাধর চাটুজ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে ওঠেন। তিনি

ছিলেন মানুষের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা। সময়ের নাগরদোলায় যখন কোলকাতা দুলে চলেছে কুসংস্কার ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে, ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ঠাকুর শোনালেন মানবপ্রেমের কথা, মানুষকে ভালোবাসার কথা, মানুষকে শ্রদ্ধা করার কথা। যুগ সৃষ্টিকারী ইতিহাসপুরুষ, কালের কাণ্ডারি শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারের খাসতালুকে থেকেও তিনি বৈরাগ্যের রাজা। প্রবল অস্থির সঙ্কটে যখন বাংলাদেশ দিশাহারা, সমাজ ও ব্যক্তিজীবন টালমাটাল তখনই পূর্ণ জ্ঞানের আলো জ্বাললেন নবীন প্রাণে। ঠাকুরের সাধনাময় আধ্যাত্মিক ভাবনায় পূর্ণ জীবন বাংলা কথাসাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই বিস্তার লাভ করে। তাঁকে নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য নন্দলাল ভট্টাচার্যের ‘শতাব্দীর কল্পতরু’ (১৩৬৭), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বীরেশ্বর বিবেকানন্দ’(১৩৬৫), ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’ (অখণ্ড ১৩৮৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রথম আলো’ (১৯৯৬), ড.পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ: শেষ অমৃত’ (১৯৯৮), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৯৯৯), ‘গঙ্গাবক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ’ (২০১২), নটরাজনের ‘শেষ ২৪৮ দিন’ (২০১৫), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী’ (পাঁচ খণ্ডে, ২০১২-২০২০)।

অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর স্নেহ, ভালবাসা ও আদর্শের আলোয় নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠেন। স্বামীজি বলতেন ঠাকুর ইচ্ছে করলে মুহূর্তের মধ্যে ‘লাখো’ বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কোনও ধর্মীয় ব্যাখ্যার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলেননি জনগণের মধ্যে । তিনি আপামর মানুষের মনের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালতে চেয়েছিলেন। সেই আলো জ্বলে উঠেছিল নরেনের মনে-প্রাণে। নরেনকে তিনি প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলেন সে (নরেন) শতদলপদ্ম। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, মন চলেছে জ্যোতির্ময় অখণ্ডের ঘরে। যেখানে সপ্তঋষি ধ্যানে তন্ময়। তার মধ্যে নরঋষিকে তাঁকে তাঁর সঙ্গে যেতে তিনি আহ্বান করেছিলেন। ঠাকুরের বিশাল হৃদয়ের ক্যানভাসেই বিবেকানন্দকে নিয়ে পরিকল্পনা ছিল। ঠাকুরের সেই শিবজ্ঞানে জীবসেবার বাণীই স্বামী বিবেকানন্দের বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় মানবকল্যাণের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে।

মহামানবের জীবনীরচনার ধারাবাহিক ইতিহাসের গতি লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। বাঙালি জনজীবন আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে, মুক্তি প্রাণ মানুষকে খোঁজার চেষ্টা করল মহামানবের জীবনীর মধ্যে। প্রাবন্ধিক স্বপনকুমার মণ্ডল বলেছেন, ‘আধুনিক ভোগবাদী জীবনবিলাসে অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের মধ্যে অত্যন্ত সহজেই কৃত্রিমতা চলে আসে। এর ফলে একদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির হাতছানি, অন্যদিকে জাতিগত চিরন্তন ঐতিহ্য রক্ষার দায়--এই দুইয়ের টানাপোড়নে আপনাতেই জীবনাচরণে কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ ঘটে। তার ফলে মধ্যবিত্তের পরিচয়ে সংকট দেখা দিয়েছে।’[১] সেই সংকটের উত্তরণে মহামানবের প্রদর্শিত পথের দিশার প্রতি জনমানসের আকর্ষণ স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালি স্বামীজির জীবনীর মধ্যে হতাশায় আলো, সান্ত্বনায় দিশা খুঁজে পেয়েছিল । মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধারণ ও সাধনে স্বামীজির ত্রাতার ভূমিকা সেখানে স্বাভাবিকতা লাভ করে। সেখানে তাঁর মহৎ জীবনীর পাশাপাশি তাঁকে কেন্দ্র করে অসংখ্য উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন, অন্নপূর্ণা দেবীর ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ (১৯২৩), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘বীরেশ্বর বিবেকানন্দ’ (মাঘ ১৩৫৫), শ্রীমতী গুপ্তের ‘বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ’ (১৯৫৭), প্রদ্যোৎ চক্রবর্তীর ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ (১৯৫৯), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রথম আলো’ (অখণ্ড ২০১০), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী’ (পাঁচটি খণ্ড ২০১২-২০২০), রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রাণসখা বিবেকানন্দ’ (অখণ্ড ২০১৯), ‘সরলা ও সন্ন্যাসী

জীবনের ঝরাপাতা ও বিবেকানন্দ' (২০১৯), গুরুপ্রসাদ মহান্তীর 'বিলে' (২০১৪), নিমাই ভট্টাচার্যের 'বিপ্লবী বিবেকানন্দ' (২০১৮), অভিজিৎ চৌধুরীর 'অণুগামিনী' (২০১৮), প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর পরিচয় বর্তমান। আবার অনেক উপন্যাসে বিবেকানন্দের উপস্থিতি পরোক্ষভাবে বা নানা অনুষঙ্গে উঠে এসেছে। সেখানেও তাঁর উপস্থিতি অত্যন্ত আবেদনক্ষম। যেমন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ' বইটির তিনখণ্ড। অন্যদিকে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'জগৎচন্দ্রহার' (২০০১), 'শ্রীরামকৃষ্ণ মেল' (২০১০), গ্রন্থে 'কে তুমি বিবেকানন্দ' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু উৎসব' সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের, 'অরূপ যাত্রা' প্রভৃতি গল্পে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ', 'ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ' প্রভৃতি গল্পেও স্বামীজির আদর্শ সমালোচিত হয়েছে।

আসলে উনিশ শতকের শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে আলোড়ন সৃষ্টি করে ক্রমশ ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের মাধ্যমে শিক্ষা ও সেবার আদর্শকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা অচিরেই বাঙালি জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ধর্মীয় অচলায়তন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের নররূপী নারায়ণ সেবাকে পাথেয় করে মানবমুখী ঐশ্বরিক চেতনার বিস্তারে বিবেকানন্দের অবিসংবাদিত ভূমিকা জনমানসে ক্রমশ তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেখানে আত্মমুক্তির চেয়ে বহুজনের হিতে, বহুজনের সুখে মানবসেবাই ঈশ্বর পূজায় একাত্মতা লাভ করে। সেদিক থেকে স্বামীজি ধর্মকেই মানবমুখী করে তোলায় তাঁর আদর্শ আধুনিক জনমানসে স্বাভাবিক ভাবেই শুধু অভিনব মনে হয়নি, সেইসঙ্গে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে। তাঁর মার্গদর্শনে বা জীবনদর্শনে আত্মবিশ্বাসের মধ্যেই আস্তিকতার বিস্তার যেমন আন্তরিকতা লাভ করে, তেমনই সেই বিশ্বাসেই জেগে ওঠে পরাধীনতা থেকে মুক্তির সোপান। সেখানে সেবার সেরা দেশসেবাই স্বাভাবিক ভাবে প্রাধান্য লাভ করে। দেশমাতাই হয়ে ওঠে আরাধ্য দেবী। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশোদ্ধারের ব্রতই স্বামীজির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। সেদিক থেকে স্বামীজির জীবনাদর্শের মধ্যেই পরাধীন দেশের মানুষ সেদিন ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। তাঁর অকাল প্রয়াণের পরেও সেই ধারা অক্ষুণ্ন থাকে। সেক্ষেত্রে স্বামীজির কায়া অকালে বিলীন হয়ে গেলেও তাঁর ছায়া ক্রমশ সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর জীবন ও আদর্শ ধর্মীয় পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে মানবজীবনের বহুধাবিস্তৃত পরিসরে, উন্নত জীবনের হাতছানি থেকে অনন্ত জীবনের পরম পরশে। সেদিক থেকে তাঁর বহুধাবিস্তারী ঘটনাবহুল রহস্যময় জীবনের তথা লোকজীবনের সঙ্গে ভাবজীবনের অলৌকিক মেলবন্ধনের প্রতি সাধারণের অপরিসীম কৌতূহলই বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর নিবিড় সংযোগ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে।

স্বামীজিকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবন ক্রমশ আলোকিত হয়ে ওঠে। সেখানে তাঁর সজীব ও সরব অস্তিত্ব নানাভাবেই প্রকাশমুখর। তাঁর জীবন ও মতাদর্শ আধুনিকমনস্ক মানুষের কাছে সমান আকর্ষণীয়। কোনও রকম ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই তাতে। একান্তভাবেই মানবকল্যাণের সঙ্গে স্বামীজির আদর্শ বিজড়িত হওয়ায় তাঁর আবেদন প্রায় সর্বজনীনতা লাভ করে। অন্যদিকে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের তীব্র আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ যেভাবে বাংলার জনমানসে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে, তার মধ্যেই তাঁর প্রভাব প্রতীয়মান। সেদিক থেকে কথাসাহিত্যের রক্তমাংসের সজীব চরিত্রে তাঁর অসাধারণ চরিত্রপ্রকৃতির প্রকাশে আপনাতেই তাঁকে চেনাজানার পাশাপাশি প্রতিকূল জীবন থেকে অনুকূল জীবনের উত্তরণের দিশাও হাতছানি দেয়। মঠ-মিশন পরিবাহিত জীবনাদর্শের জনমানসে স্বামীজির আবেদন নানাভাবেই নতুন করে আবিষ্কার করার প্রবণতা এখনও জারি আছে । সেখানে তাঁর জীবনী রচনার পাশাপাশি তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার ধারাও অব্যাহত থাকে। সেই উপন্যাসের ধারা সময়ান্তরে গতি

লাভ করে। সেখানে বাংলায় মহাজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের ধারায় স্বামীজির উজ্জ্বল উপস্থিতি নানাভাবেই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। ধর্মীয় পরিসর বা সমাজ-সংস্কার আন্দোলন প্রভৃতির বাইরেও স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নানাভাবেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে । বিশেষ করে আধুনিক বাঙালিমানসে তাঁর জীবনাদর্শ নতুন জীবনের হাতছানি বয়ে আনে। তাঁর অজানা খনির পরশমণির হদিশে তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যের ভাঁড়ার ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধিমান। স্বামীজি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হয়েও সমকালের পরিসরে আজও তাঁর অস্তিত্ব জনমানসে প্রকট হয়ে রয়েছে। সেখানে গৌতম বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যদেব, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রমুখের সঙ্গে সংযোগ থাকা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ সমকালীনতায় অনেক বেশি আবেদনক্ষম ও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। গৈরিক বসনাবৃত সন্ন্যাসী হয়েও তাঁর আবেদন ও বিস্তার সাধারণ গৃহী মানুষের মনেও ঠাঁই পায় সহজে ও স্বাভাবিকতায় । সেখানে বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়আশয়ে তাঁকে তুলে ধরার প্রবণতা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই তাতে সময়ের দাবিও মূর্ত হয়ে ওঠে।

সূত্র নির্দেশ

১. স্বপনকুমার মণ্ডল, বাছাই প্রবন্ধ (মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং স্বামী বিবেকানন্দ), সংবেদন, মালদা, পৃ. ৯২

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (প্রথম খণ্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৫

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় খন্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৫৫

৩অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (তৃতীয় খণ্ড), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৭৬

৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভক্ত বিবেকানন্দ, (রচনাবলী সপ্তম খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২

৫. অমলেশ ত্রিপাঠী 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯

৬. অমলেন্দু দাসগুপ্ত, বুদ্ধ তথাগত', দিকপাল ভিক্ষু, বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র, কলিকাতা, ১৯৯৫

৭. অন্নপূর্ণা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, নব গ্রন্থ কুঠির, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৩০

৮. অলোক কুমার সেন, যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ, গীতাঞ্জলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭

৯. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বিবেকানন্দ জীবন ও শিল্প, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪

১০. উজ্জ্বলকুমার দাস, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কথামৃত, তপন পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, ষষ্ঠ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪

১১. কালিদাস ভদ্র, বিশ্বপথিক স্বামী বিবেকানন্দ, শঙ্কর বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১

১২. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী মা ও বিবেকানন্দ', সপ্তর্ষি, কলকাতা, ১৯৬৩

১৩. অমলেশ ত্রিপাঠী ‘ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯
১৪. অমলেন্দু দাসগুপ্ত, বুদ্ধ তথাগত’, দিকপাল ভিক্ষু, বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র, কলিকাতা, ১৯৯৫
১৫. অলোক কুমার সেন, যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ, গীতাঞ্জলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭
১৬. আশীষ লাহিড়ী, ‘স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙালির সেকিউলার বিবেক’, অবভাস, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ২০১৪
১৭. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বিবেকানন্দ জীবন ও শিল্প, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪
১৮. উজ্জ্বলকুমার দাস, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কথামৃত, তপন পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, ষষ্ঠ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪
১৯. কালিদাস ভদ্র, বিশ্বপথিক স্বামী বিবেকানন্দ, শঙ্কর বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১
২০. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী মা ও বিবেকানন্দ’, সপ্তর্ষি, কলকাতা, ১৯৬৩
২১. জীবন মুখপাধ্যায়, ‘স্বামী বিবেকানন্দ ও যুব সমাজ’, ওরিয়েন্ট বুক এম্পোরিয়াম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭২
২২. জ্যোতির্ভূষণ দত্ত, সময়ের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩
২৩. তাপস বসু, মার্ক্সবাদীদের চোখে বিবেকানন্দ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩
২৪. তরুণ মুখোপাধ্যায়, অনুধ্যানে বিবেকানন্দ, ধ্রুপদী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১৩
২৫. দিগ্বিজয় দে সরকার, চৈতন্যদেব বিবেকানন্দ ও পঞ্চানন বর্মা, রেণু প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫
২৬. দিলীপকুমার মিত্র, বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের এক জ্যোতির্ময় পুরুষের জীবনের বিচিত্র কথা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪২১
২৭. দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, বিবেকানন্দ বহুরূপে সম্মুখে, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮
২৮. নরহরি কবিরাজ, উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯
২৯. নিমাইসাধন বসু, শাশ্বত বিবেকানন্দ, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২
৩০. ১৮. নিমাই ভট্টাচার্য, ‘বিপ্লবী বিবেকানন্দ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯
৩১. নীলকণ্ঠ ঘোষাল, দার্শনিক বিবেকানন্দ, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪
৩২. পৃথ্বীরাজ সেন, ভারতাত্মা বিবেকানন্দ, গীতাঞ্জলী, কলকাতা, ২০১৯
৩৩. পৃথ্বীরাজ সেন, স্বামী বিবেকানন্দ : জীবন ও দর্শন, শুভম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩
৩৪. প্রমথনাথ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৯
৩৫. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ‘স্মরণে মননে বিবেকানন্দ’, বর্ণালি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭১
৩৬. প্রণবরঞ্জন ঘোষ, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৯, পরিবর্তিত সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৫
৩৭. প্রণবকুমার ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ : নানা রূপে, ভাস্বতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১১

৩৮. প্রণবেশ চক্রবর্তী, শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ, ভস্তক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩
৩৪. বারিদবরণ ঘোষ, বিবেকানন্দ বন্দনা, সাহিত্যম্‌, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪২২
৩৫. বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, প্রকাশক: স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৫৫, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪২৩
৩৬. বিপ্লব চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ কালে কালোত্তরে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৪২০
৩৭. ব্রজপ্রাণা প্রব্রাজিকা, স্বামীজির কৃস্টিন, প্রকাশক, স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্ষয় তৃতীয়া ১৪০২, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, জৈষ্ঠ ১৪২৩
৩৮. বেদান্তপ্রাণা প্রব্রাজিকা, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪
৩৯. শংকর মুখোপাধ্যায়‘আমি বিবেকানন্দ বলছি’, সাহিত্যম্‌, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০৮, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১০
৪০. শ্রীমতী গুপ্ত, বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ, অনির্বাণ প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রকাশ ১৯৫৭
৪১. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী’ (প্রথম খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২
৪২. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী’ (দ্বিতীয় খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩
৪৩. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী’ (তৃতীয় খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪
৪৪. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী’ (চতুর্থ খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
৪৫. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের জীবনী’ (পঞ্চম খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২০
৪৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ‘প্রথম আলো’, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০